বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে কম্‌প্লায়েন্স এবং ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি
একটি পর্যালোচনা

শহীদুল ইসলাম ভুঁইয়া*

সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধের শুরুতে বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের অভিযাত্রা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এরপর যথাক্রমে কম্‌প্লায়েন্স কী, কম্‌প্লায়েন্স এর মৌলিক উৎস, পোশাক শিল্পে শ্রম আইনের উল্লেখযোগ্য লঙ্ঘন, স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা-কল্যাণ-অগ্নিকান্ড ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধানাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর লঙ্ঘন ও সমস্যা সমাধানকল্পে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে এতদ্‌সংক্রান্ত ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে পরিপূর্ণরূপে কম্‌প্লায়েন্স রক্ষায় একটি সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে।

মূল শব্দসমূহ: কম্‌প্লায়েন্স, তৈরি পোশাক শিল্প, শিল্পনীতি, শ্রমনীতি এবং ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি।

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্পে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। এ দেশের সূক্ষ্ম বস্ত্র 'মসলিন' মিশরের পিরামিডে ব্যবহৃত হবার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে, সুলতানি ও মোঘল আমলে এমনকি ইংরেজ আমলেও বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মসলিন কাপড় রপ্তানির কথা সর্বজনবিদিত। পঞ্চদশ শতাব্দিতে পর্তুগীজ বণিকরা এ দেশের সাথে ইউরোপের বাণিজ্যের প্রসার ঘটায়। তখন শিল্প ও মসলিন বস্ত্র রপ্তানি শুরু হয়। ওলন্দাজ, ফরাসিদের হাত ঘুরে তা অষ্টাদশ শতাব্দিতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পৌঁছায়। এরমধ্য দিয়ে বাণিজ্যেও নতুনত্ব আসে। রপ্তানি বাণিজ্যে যুক্ত হয় পাট ও পাটজাত পণ্য। সাম্রাজ্যবাদি দুঃশাসনে এক সময় আমাদের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প মুখ থুবড়ে পড়ে।

বাংলাদেশে বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন হলেও ১৯৩০-এর দশকে প্রথম বিদ্যুৎ চালিত আধুনিক বস্ত্রশিল্প স্থাপিত হয় (দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২০১৩)। স্পিনিং ও ওয়েভিং সুবিধাসহ কম্পোজিট টেক্সটাইল স্থাপিত হয়। এর পূর্বে হস্তচালিত তাঁতই বস্ত্র তৈরির প্রধান হাতিয়ার ছিল। ধীরে ধীরে হোশিয়ারি ও ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিসিং টেক্সটাইল স্থাপিত হয়। বৃহত্তম ঢাকা এসব শিল্পের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠে এবং দেশের চাহিদা মেটায়।

'রিয়াজ স্টোর' নামে ১৯৬০ সালে ঢাকায় একটি দর্জির দোকান করা হয়েছিল। ১৩ বছরের মাথায় নাম পাল্টে দোকানটি 'মেসার্স রিয়াজ গার্মেন্ট লি.' নামে ১৯৭৩ সালে যাত্রা শুরু করে যা বাংলাদেশের প্রথম তৈরি পোশাক কারখানা। ১৯৭৮ সালে এ কারখানা থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) মাধ্যমে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের একটি পোশাক বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানে প্রথমবারের মতো ১৩ মিলিয়ন ফ্রাঁতে ১০ হাজার শার্ট রপ্তানি হয় (দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২০১৩ এবং Ismail, 2012)।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের অভিযাত্রা

স্বাধীনতার পর অধিকাংশ টেক্সটাইল মিলই পরিত্যক্ত বা বন্ধ অবস্থায় ছিল। এ শিল্পগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। এরমধ্যে বেশকিছু বস্ত্র মিলও ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী ঢালাও জাতীয়করণের যুগ শেষ হবার পর আশির দশকে

---

* অ্যাড্‌ভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা, E-mail: jabid02@gmail.com

অধিকাংশ বস্ত্রকল বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয়। সরকারি ও বেসরকারি উৎপাদন দিয়ে দেশের সাধারণ চাহিদার প্রায় পুরোটাই মেটানো হয়। বাংলাদেশ আশির দশকে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো ও যুক্তরাষ্ট্রে জিএসপির আওতায় প্রায় শুল্কমুক্তভাবে তৈরি পোশাক রপ্তানির সন্ধান পায়। শুরুর দিকে তুলা, সুতা, কাপড়, বোতাম, জিপার, সেলাই সুতা ও মেশিনারি সবই আমদানি করা হতো। দেশে শুধু দর্জির কাজটা হতো। এতেই গার্মেন্টস শিল্প মালিকরা বেশ লাভবান হতে থাকেন। তখন প্রধানত ওভেন পোশাকই রপ্তানি হতো। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের ওভেন পোশাকের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। নিট পোশাক রপ্তানিও তখন থেকে শুরু হয়। এভাবে তৈরি পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধি পায়।

১৯৭৬ সালে ১৭৬ জন শ্রমিক নিয়ে ৪টি গার্মেন্টস যাত্রা শুরু করলেও ১৯৮০ সালে তা দাঁড়ায় ৫০-এ এবং শ্রমিক সংখ্যা ৪,০০০। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ তৈরি পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির (BGMEA) আওতায় ৪,৪৯৭টি কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে চালু কারখানা ২,৮৫৮টি (BGMEA Newsletter, 2011)। বাংলাদেশ নিট পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (BKMEA) ১,৫০৭টি কারখানার মধ্যে চালু রয়েছে ৯৮০টি। এসব কারখানার ৮০ শতাংশ শ্রমিকই নারী (IART, 2011)।

বিজিএমইএ গঠিত হবার পর ১৯৮৫ সাল থেকে নানা প্রণোদনা ও প্যাকেজ সুবিধায় উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে ব্যাপক হারে তৈরি পোশাক রপ্তানি শুরু হয়। বিশ্বের ১১৫ রকমের পোশাকের চাহিদার বিপরীতে বাংলাদেশ রপ্তানি করছে ৩৬ প্রকারের পোশাক। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০টি দেশে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। বাংলাদেশের সাড়ে ৪ হাজার কারখানা থেকে বছরে ১৯০ বিলিয়ন ডলারের তৈরি পোশাক রফতানি হয়ে থাকে (BGMEA Newsletter, 2011)।

বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮০ শতাংশ এ শিল্প থেকে আসে। গ্যাপ, কেলভিন ক্লেইন, টমি হিলকিগার, টেসকো, ওয়াল-মার্ট, জে সি পেনি, এইচ. অ্যান্ড এম, মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার, কোলস ও কেয়ারফোর এর মতো বিখ্যাত ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশে পোশাক বানানো হয়। পোশাক শিল্প এখন বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত এবং বিশ্বের তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়।

১৯৯৩ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে জিএসপি সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে দেশীয় সুতা ও বস্ত্র ব্যবহারের শর্ত দেয় (দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২০১৩)। এতে উদ্যোক্তারা বস্ত্রশিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হন। অপেক্ষাকৃত বড় মূলধনী বিনিয়োগ বিধায় রপ্তানিমুখী কম্পোজিট টেক্সটাইল শিল্প স্থাপনে অপেক্ষাকৃত কম মূলধন লাগে বিধায় অনেক উদ্যোক্তা নিট বস্ত্রশিল্প স্থাপন করেন। নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রিক এ নিট বস্ত্রশিল্প এখন সারাদেশে ছড়িয়ে আছে। নিট পোশাক রপ্তানি এখন ওভেন পোশাক রপ্তানির প্রায় সমান।

বাংলাদেশের ৪০ লাখ মানুষ বস্ত্র শিল্পে যুক্ত হয়েছেন- যাদের বেশির ভাগই নারী। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম, রক্ত ও ঘাম এ শিল্পকে করেছে মহিমান্বিত। এমনিভাবে পোশাক শিল্প আজ দেশের মূল ধারার শিল্পে রূপ নিয়েছে।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, নানামুখী অব্যবস্থাপনা, আইনের অমান্যতা ও প্রায়োগিক ব্যর্থতার কারণে আমাদের গৌরবদীপ্ত পোশাক শিল্প আজ হুমকির সম্মুখীন এ শিল্পের মালিক-শ্রমিক সম্পর্কটি ক্রমশ শোষক-শোষিতের মতো নিদারুণ হাহাকারে পর্যবসিত হচ্ছে।

প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য

বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো- দেশের গৌরবময় পোশাক শিল্প খাতে বিরাজমান অব্যবস্থাপনা ও অসহিষ্ণুতার প্রকৃত কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য প্রতিকার খুঁজে বের করা এবং জাতির সামনে এ লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ

তুলে ধরা। যাতে করে আমাদের এ ঐতিহ্যমণ্ডিত খাতটি দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব বাজারে গৌরবের তিলক হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের শিল্পনীতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি নিজস্ব শিল্পনীতি রয়েছে। জাতীয় শিল্পনীতি- ২০১০ এ বলা হয়েছে:

বাংলাদেশের শিল্প খাতের নিয়ামক হবে একটি উদ্দীপ্ত ও গতিশীল ব্যক্তিখাত। বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা পালন করবে। অব্যাহত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (অধ্যায়-২: ২.২, অভীষ্ট লক্ষ্য) (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১০)।

কম্‌প্লায়েন্স কী

ইংরেজি Complaince শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পরিপালন, মেনে নেয়া ইত্যাদি। সংক্ষেপে, যা যা মানতে হয়, যা যা মানা প্রয়োজন- সেসব পরিপালনকে Compliance বলে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে 'মেনে নেয়া' বলতে শ্রম ও শ্রমিকের কর্ম পরিবেশগত নানাবিধ মান্যতাকে বুঝানো হয়। পোশাক শিল্প ব্যবস্থাপনার পরতে পরতে আবশ্যিকভাবে অনুসরণীয় কর্ম পরিবেশ বান্ধব বিধিবদ্ধ বিধানাবলী ও নীতিমালার সামষ্টিক রূপই হলো Compliance।

পোশাক শিল্পে 'কম্‌প্লায়েন্স' এর মৌলিক উৎস হিসেবে দেশে প্রচলিত আইন

ক. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬;

খ. অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন, ২০০৩;

গ. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫;

ঘ. ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ এর ধারা ১৮ (ক) অনুযায়ী, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড।

পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ শ্রম আইনের উল্লেখযোগ্য লঙ্ঘন

- শ্রমিকগণকে 'নিয়োগপত্র' ও সার্ভিস বই প্রদান না করা [ধারা: ৫, ৬ এর লঙ্ঘন];
- কর্মঘন্টা ও ওভার টাইম ওয়ার্ক করানোর ক্ষেত্রে শ্রম আইন অনুসরণ না করা [ধারা: ৪ (৮), ১০০, ২৬৪ (১) (১০) এর লঙ্ঘন] ফলে, রিক্ত হাতেই তাঁদেরকে বিদায় নিতে হয়। এ কারণে এ শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রমিকগণের না সৃষ্টি হয় মমত্ববোধ, না দায়বদ্ধতা, না পেশাদারিত্ব;
- যথাসময়ে প্রাপ্য উপযুক্ত মজুরি, ওভার টাইম বিল, বোনাস ইত্যাদি পরিশোধ না করা (ধারা: ১২৩ এর লঙ্ঘন);
- শ্রম আইনে বিধৃত 'ছুটি বিধি' প্রতিপালন না করা। মজুরিসহ মাতৃত্বকালিন সুবিধা প্রদানে গড়িমসি করা (ধারা: ৪৬, ১০৩, ১০৪ এর লঙ্ঘন);
- শ্রম আইনানুযায়ী কারখানায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং উৎপাদন ভবনের অবকাঠামোগত সুষ্ঠু নিরাপত্তা (যেমন- বিকল্প সিঁড়ি) বিধান না করা;
- কারখানায় আদর্শ তাপানুকূল ব্যবস্থা, গ্রীষ্মকালে বিশুদ্ধ ঠান্ডা পানি সরবরাহ, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা, ডে-কেয়ার, প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা, ক্যান্টিন, বিশ্রাম কক্ষ, শিশু কক্ষ, টয়লেট ইত্যাদির অনুপস্থিতি;

- নিম্ন মজুরি এবং নারী ও পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে মজুরি বৈষম্য। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) এর এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, একই কাজের জন্য একজন পোশাক শ্রমিক নারী হওয়ার কারণে পুরুষ শ্রমিকের চাইতে প্রায় ২৮ শতাংশ কম মজুরি পান (ধারা: ৩৪৫ এর লঙ্ঘন);
- চাকরির অনিশ্চয়তা/নিরাপত্তাহীনতা, ইত্যাদি। (প্রায়শ শ্রমিকগণকে অহেতুক বা ব্যক্তিগত কারণে চাকরিচ্যুত করা হয় অথবা চাকরিচ্যুতির ভয়/ হুমকি দেয়া হয়);
- নারী শ্রমিকগণকে বিভিন্ন কৌশলে ভোগান্তিসহ যৌন হয়রানির শিকারে পরিণত করা (যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অপ্রকাশিতই থেকে যায়) (ধারা: ১০৯, ৩৩২ এর লঙ্ঘন);
- সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ না দেয়া। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) এর জরিপ অনুযায়ী, পোশাক শিল্পের মাত্র ৬ শতাংশ শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত- যার বেশির ভাগই পুরুষ। যদিও পোশাক শিল্পের স্থায়ী শ্রমিকগণের মধ্যে ৮০ ভাগই অর্থাৎ প্রায় ৩৫ লাখ নারী (*বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, চতুর্বিংশতিতম খণ্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪১৩*);
- অন্যদিকে ট্রেড ইউনিয়ন করতে না পারার কারণে শ্রমিকগণ মালিক পক্ষের সাথে যৌথ দরকষাকষি করতে ব্যর্থ হন (ধারা: ১৯৫- ক, খ, এর লঙ্ঘন)।

পোশাক শিল্পে বিরাজমান অন্যান্য সমস্যা

দেশের অর্থনীতির প্রধানতম চালিকা শক্তি এ খাতে আরও সমস্যা আছে যা শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগায়। এগুলো হলো- শ্রমিক ও মধ্যম সারির কর্মকর্তাদের দ্বন্দ্ব, নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, বাড়িভাড়া ঘন ঘন বৃদ্ধি, স্থানীয় প্রভাবশালীদের দ্বারা হয়রানি, গার্মেন্টস বন্ধের গুজব, স্বার্থান্বেষী এনজিও-দের নেতিবাচক ভূমিকা ইত্যাদি।

সারণি ১: কর্মস্থলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত শ্রম আইনের বিধান (বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩)।

ক্রমিক নং	ধারা নং	অধ্যায়	বিষয়	প্রযোজ্যক্ষেত্র
০১	৫১ (ক)	স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থ্য (৫ম অধ্যায়)	কর্মকক্ষ, সিঁড়ি, যাতায়াত পথ ঝাড়ু দেয়া	প্রতিদিন
০২	৫১ (খ)		কর্মকক্ষের মেঝে ধৌত করা	সপ্তাহে ১ দিন
০৩	৫১ (ঘ-১)		অভ্যন্তরীণ দেয়াল, পার্টিশন, ছাদ, সিঁড়ি, যাতায়াত পথ পুনরায় রং বা বার্ণিশ করা	তিন বছরে ১ বার
০৪	৫১ (ঘ-২)		অভ্যন্তরীণ দেয়াল, পার্টিশন, ছাদ, সিঁড়ি, যাতায়াত পথ পরিষ্কার করা	১৪ মাসে ১ বার
০৫	৫১ (ঘ-৩)		অভ্যন্তরীণ দেয়াল, পার্টিশন, ছাদ, সিঁড়ি, যাতায়াত পথ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে চুনকাম বা রং করা	১৪ মাসে ১ বার
০৬	৫৮ (৩)		গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা খাবার পানি সরবরাহ করা	কমপক্ষে ২৫০ জন শ্রমিক থাকলে
০৭	৫৯ (খ)		শৌচাগার ও প্রক্ষালন কক্ষের ব্যবস্থা	পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকের জন্য স্বতন্ত্রভাবে
০৮	৬২ (১)	নিরাপত্তা (৬ষ্ঠ অধ্যায়)	অগ্নিকান্ডের সময় প্রত্যেক তলার সাথে সংযোগ রক্ষাকারী বিকল্প সিঁড়িসহ বহির্গমন ও অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামের ব্যবস্থা	কমপক্ষে ১টি

ক্রমিক নং	ধারা নং	অধ্যায়	বিষয়	প্রযোজ্যক্ষেত্র
০৯	৬২ (৮)		অগ্নি নির্বাপন মহড়ার আয়োজন ও রেকর্ড করা	কমপক্ষে ৫০ জন শ্রমিক কর্মরত থাকলে বছরে কমপক্ষে ১ বার
১০	৬৮ (৩)		ক্রেন ও অন্যান্য উত্তোলন যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করা	কমপক্ষে বছরে ১ বার ১ জন উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা
১১	৬৯ (১-গ)		Hoist & Lift পরীক্ষা করা	কমপক্ষে ৬ মাসে ১ বার ১ জন উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা
১২	৮০ (১)	স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা (৭ম অধ্যায়)	সংঘটিত দুর্ঘটনা (হতাহত বা বিস্ফোরণ, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি) সম্পর্কে লেবার ইন্সপেক্টরকে নোটিশ প্রদান	২ কর্মদিবসের মধ্যে
১৩	৮১		বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতির সংঘটিত বিপজ্জনক ঘটনা সম্পর্কে লেবার ইন্সপেক্টারকে নোটিশ প্রদান	৩ কর্মদিবসের মধ্যে
১২	৮০ (১)	স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা (৭ম অধ্যায়)	সংঘটিত দুর্ঘটনা (হতাহত বা বিস্ফোরণ, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি) সম্পর্কে লেবার ইন্সপেক্টরকে নোটিশ প্রদান	২ কর্মদিবসের মধ্যে
১৩	৮১		বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতির সংঘটিত বিপজ্জনক ঘটনা সম্পর্কে লেবার ইন্সপেক্টারকে নোটিশ প্রদান	৩ কর্মদিবসের মধ্যে
১৪	৮৯ (২)	কল্যাণমূলক ব্যবস্থা (৮ম অধ্যায়)	প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম হিসেবে বাক্স বা আলমিরা রাখা	প্রতি ১৫০ জন শ্রমিকের জন্য কমপক্ষে ১টি
১৫	৮৯ (৫)		ডিসপেন্সারি, রোগীকক্ষ, ডাক্তার ও নার্স রাখা	কমপক্ষে ৩০০ জন শ্রমিক কর্মরত থাকলে
১৬	৮৯ (৬)		স্থায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিচালনা	৫ হাজার বা তদূর্ধ শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে
১৭	৮৯ (৮)		কল্যাণ কর্মকর্তা	৫শ বা তদূর্ধ শ্রমিক নিযুক্ত থাকলে
১৮	৯০		বাধ্যতামূলক সেইফটি রেকর্ডবুক ও সেইফটি বোর্ড সংরক্ষণ	২৫ জনের বেশি শ্রমিক কর্মরত থাকলে
১৯	৯০ (ক)		সেইফটি কমিটি গঠন ও তা কার্যকর	৫০ বা তদূর্ধ সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত থাকলে।
২০	৯২ (১)		যথেষ্ট সংখ্যক ক্যান্টিন চালু রাখা	১০০ জনের বেশি শ্রমিক কর্মরত থাকলে
২১	৯৩ (১)		যথেষ্ট ও উপযুক্ত সংখ্যক বিশ্রাম কক্ষ রাখা (ক্যান্টিন চালু থাকলে বিশ্রাম কক্ষ লাগবে না)	৫০ জনের বেশি শ্রমিক কর্মরত থাকলে
২২	৯৩ (৩)		মহিলা শ্রমিকের জন্য পৃথক বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা	২৫ জনের বেশি মহিলা শ্রমিক কর্মরত থাকলে
২৩	৯৩ (৩)		মহিলা শ্রমিকের জন্য পর্দা ঘেরা জায়গার ব্যবস্থা	২৫ জনের কম সংখ্যক মহিলা শ্রমিক কর্মরত থাকলে থাকলে
২৪	৯৪ (১)		শিশু (৬ বছরের কম বয়সি) কক্ষের ব্যবস্থা	৪০ বা তদূর্ধ সংখ্যক মহিলা শ্রমিক কর্মরত থাকলে

ক্রমিক নং	ধারা নং	অধ্যায়	বিষয়	প্রযোজ্যক্ষেত্র
২৫	৯৯		বাধ্যতামূলক গ্রুপ বীমা চালুকরণ	কমপক্ষে ১০০ জন স্থায়ী শ্রমিক কর্মরত থাকলে।
২৬	১৬০ (১১)	দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ (১২ তম অধ্যায়)	যৌথ বীমা কর্মসূচির অধীনে দুর্ঘটনাজনিত বীমা স্কীম চালু ও বাস্তবায়ন।	অন্যূন ১০ জন শ্রমিক কর্মরত থাকলে।

গত ২৩.১২.২০১২ তারিখে বিকেএমইএ এক সভায় নিট শ্রমিকদের মৃত্যুজনিত বীমা দাবীর পরিমাণ জনপ্রতি ১ লাখ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২ লাখ নির্ধারণ করেছেন (BKMEA, 2013)।

অগ্নিকান্ড এবং এতদ্‌সংক্রান্ত আইনের বিধান

পোশাক কারখানায় মাঝে-মধ্যেই আগুন লাগে। এটি নতুন কোনো কথা না। অগ্নিকান্ডের কারণ সম্পর্কে সাধারণ প্রচলিত ধারণার কয়েকটি হচ্ছে: ক). সাবোটাজ, খ). শত্রুতা, গ). দেশ বিরোধী চক্রের কারসাজি, ঘ). বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিট, ঙ). অসতর্কতা, চ). গ্যাসের চুলা জনিত, ছ). বয়লারে বিস্ফোরক বা ধুমপান, জ). বৈদ্যুতিক চুলা বা ইস্ত্রি ইত্যাদি।

বৈদ্যুতিক কারণে আগুন

এ বিষয়টি অনুসন্ধান করে নিম্নোক্ত কারণগুলো পাওয়া যায়- ক). নিম্নমানের বৈদ্যুতিক সামগ্রী ব্যবহার, খ). 'আন্ডার সাইজ' কেবল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার, গ). পরিকল্পনাহীন বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, ঘ). যথাযথ আর্থ ওয়্যারিং এবং নিয়মিত চেকিং এর অভাব।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (BILS) এর হিসেব মতে, ১৯৯০ সন থেকে ২০১২ সন পর্যন্ত পোশাক কারখানায় আগুনে নিহত হয়েছেন ৪৩১ জন। অন্যদিকে বিজিএমইএ'র দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯০ থেকে ২০১২ সালের ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত গার্মেন্টে ২১৯টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে (BGMEA Newsletter, 2014)। এরমধ্যে ২৫টি কারখানার প্রায় ৪০০ শ্রমিকের নির্মম মৃত্যু হয়। এরমধ্যে ১৯৯০ সালে একটি অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ১০ জন পদদলিত ও ১৩ জন আগুনে পুড়ে মারা যান। ১৯৯৫ সালে তিনটি অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ১৪ জন পদদলিত হয়ে মারা যান। ১৯৯৬ সালের একটি অগ্নিকান্ডের ঘটনায় পুড়ে ১২ জন মারা যান। ১৯৯৭ সালে ছয়টি অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ৩০ জন পদদলিত ও ১১ জন পুড়ে মারা যান। ১৯৯৮ সালে চারটি দুর্ঘটনা ঘটে। আগুনে পুড়ে মারা যান একজন। ১৯৯৯ সালে ১৬টি ঘটনা ঘটে এবং দু'জন মারা যান। ২০০০ সালে ১৯টি ঘটনায় আগুনে পুড়ে মারা যান ১২ জন। ২০০১ সালে ২৩টি ঘটনায় ২১ জন পদদলিত হয়ে মারা যান। ২০০৪ সালে ১৬টি ঘটনায় পদদলিত হয়ে সাতজন মারা যান। ২০০৫ সালে নয়টি অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ২২ জন আগুনে পুড়ে মারা যান। ২০০৬ সালে ১৫টি ঘটনা ঘটে। আগুনে পুড়ে মারা যান ৬৪ জন এবং পদদলিত হয়ে মারা যান তিনজন। ২০১০ সালে ১৯টি ঘটনায় ৫১ জন পুড়ে মারা যান। এরমধ্যে গরিব অ্যান্ড গরিব গার্মেন্টে ২১ জন, মেট্রিক্স সোয়েটারে একজন ও হা-মীম গ্রুপের একটি কারখানায় ২৯ জন মারা যান। ২০১১ সালে ১৮টি ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ইউরো টেক্সে দু'জন পুড়ে মারা যান (BGMEA Newsletter, 2014)।

২০১২ সালে বেশ কিছু অগ্নিকান্ডের মধ্যে তাজরীন ফ্যাশনস লিঃ এর অগ্নিকান্ড ছিল আলোচিত ঘটনা। গত ২৪ শে নভেম্বর, ২০১২ তারিখ সন্ধ্যা রাতে সাভারের আশুলিয়া ইউনিয়নের নিশ্চিন্তপুর এলাকার তাজরিন ফ্যাশন নামীয় গার্মেন্টস কারখানায় সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে কালো পিন্ড হয়ে যায় অন্তত ১২৪ জন নিরীহ শ্রমিক। এদের

অধিকাংশই গ্রাম বাংলার সরলমতি অভাবী বস্ত্র-বালিকা। আগুনে পুড়ে তাঁদের কচি দেহগুলো কয়লা হয়ে যায়। সাথে সাথে নিঃশেষ হয়ে যায় তাঁদের জীবনের সব স্বপ্ন-সাধ।

অগ্নিকান্ডের এ ঘটনায় আহত হন দু'শতাধিক, বেকার হন সহস্রাধিক আর আর্থিক ক্ষতি হয় শতকোটি টাকার। কারখানার ছয়টি ফ্লোরের মধ্যে কয়েকটিতে মধ্যম সারির কর্মকর্তাদের দরজা আটকে রাখা আর মালিকের অবহেলা-অব্যবস্থাপনার কারণেই এত হতাহত আর প্রাণহানি ঘটে। কারখানাটির কোনো জরুরি নির্গমন সিঁড়ি ছিল না। তিনটি সিঁড়ির মধ্যে দু'টি নিচতলায় গুদামের ভেতরে এসে শেষ হয়েছে আর একটি একটু দূরে। আর আগুন লেগেছিল এ গুদামেই। অন্যদিকে যথাযথ অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় তাজরীনের ফায়ার লাইসেন্স নবায়ন করেনি ফায়ার সার্ভিস। গত ৩০ শে জুন, ২০১২ এ কারখানার ফায়ার লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এ আগুনের ঘটনা শুধু দেশেই নয়, বিদেশের মানুষের কাছেও আশুলিয়ার নিশ্চিন্তপুরকে পরিচিত করেছে ব্যাপকভাবে। বিশ্বের শীর্ষ সারির মিডিয়াগুলোতেও এ ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে গুরুত্বসহকারে। সর্বশেষ গত ৫ ডিসেম্বর, ২০১২ রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নব গার্মেন্ট নামে একটি পোশাক কারখানায় অগ্নিকান্ডের আতঙ্কে পদদলিত হয়ে একজন নিহত এবং অর্ধশতাধিক আহত হয়েছে।

সম্প্রতি ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা সাভার ও আশুলিয়া এলাকার ২৩২টি কারখানা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। তাঁরা কারখানার অগ্নিনিরাপত্তা-সম্পর্কিত ২৬টি শর্ত যাচাই করে দেখেন যে, ২৩ দশমিক ২৮ শতাংশ কারখানার অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খুবই নাজুক। ৩৭ দশমিক ৯৩ শতাংশ কারখানার মোটামুটি, আর ৩৮ দশমিক ৭৯ শতাংশ কারখানার অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ভালো (দৈনিক প্রথম আলো, ২০১২)।

অগ্নিকান্ডের সময় শ্রমিকেরা তাড়াহুড়ো করে বের হতে পারেন না। এর প্রধান কারণ হলো- কারখানা চলার সময় প্রধান বা অপ্রধান সবগুলো গেট তালাবদ্ধ থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন ফ্লোরের ওঠা-নামার সিঁড়িগুলো থাকে সরু। আগুন নেভানোর ব্যবস্থা থাকে অপ্রতুল ও অপর্যাপ্ত।

অগ্নিকান্ড সম্পর্কে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬)

শ্রম আইনে বলা হয়েছে:

ধারা: ৬২। অগ্নিকান্ড সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন:

(১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে বিধি দ্বারা নির্ধারিত ভাবে অগ্নিকান্ডের সময় প্রত্যেক তলার সাথে সংযোগ রক্ষাকারী অন্ততঃ একটি বিকল্প সিঁড়িসহ বহির্গমনের উপায় এবং অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে কোনো কক্ষ হইতে বহির্গমনের পথ তালাবদ্ধ বা আটকাইয়া রাখা যাইবে না, যাহাতে কোনো ব্যক্তি কক্ষের ভিতরে কর্মরত থাকিলে উহা তৎক্ষণাৎ ভিতর হইতে সহজে খোলা যায়, এবং এই প্রকার সকল দরজা, যদি না এগুলি স্লাইডিং টাইপের হয়, এমনভাবে তৈরি করিতে হইবে যেন উহা বাহিরের দিকে খোলা যায়, অথবা যদি কোনো দরজা দুইটি কক্ষের মাঝখানে হয়, তাহা হইলে উহা ভবনের নিকটতম বহির্গমন পথের কাছাকাছি দিকে খোলা যায় এবং এ প্রকার কোনো দরজা কক্ষে কাজ চলাকালীন সময়ে তালাবদ্ধ বা বাধাগ্রস্থ অবস্থায় রাখা যাইবে না।

(৪) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সাধারণ বহির্গমণের জন্য ব্যবহৃত পথ ব্যতীত অগ্নিকান্ড কালে বহির্গমনের জন্য ব্যবহার করা যাইবে-এরূপ প্রত্যেক জানালা, দরজা বা অন্য কোনো বহির্গমন পথ স্পষ্টভাবে লাল রং দ্বারা বাংলা অক্ষরে অথবা অন্য কোনো সহজবোধ্য প্রকারে চিহ্নিত করিতে হইবে।

(৫) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে, উহাতে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমিককে অগ্নিকান্ডের বা বিপদের সময় তৎসম্পর্কে হুশিয়ার করার জন্য, স্পষ্টভাবে শ্রবণযোগ্য হুশিয়ারি সংকেতের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৬) প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কক্ষে কর্মরত শ্রমিকগণের অগ্নিকান্ডের সময় বিভিন্ন বহির্গমন পথে পৌঁছার সহায়ক একটি অবাধ পথের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৭) যে প্রতিষ্ঠানে উহার নীচ তলার উপরে কোনো জায়গায় সাধারণভাবে দশজন বা ততোধিক শ্রমিক কর্মরত থাকেন অথবা বিস্ফোরক বা অতিদাহ্য পদার্থ ব্যবহৃত হয় অথবা গুদামজাত করা হয়, সে প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্ডকালে বহির্গমনের উপায় সম্পর্কে সকল শ্রমিকেরা যাহাতে সুপরিচিত থাকেন এবং উক্ত সময়ে তাহাদের কি কি করণীয় হইবে, তৎসম্পর্কে তাহারা যাহাতে পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ লাভ করিতে পারেন, সেই বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) পঞ্চাশ বা ততধিক শ্রমিক/কর্মচারী সম্বলিত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার অগ্নিনির্বাপন মহড়ার আয়োজন করিতে হইবে এবং এ বিষয়ে মালিক কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় একটি রেকর্ড বুক সংরক্ষণ করিতে হইবে।

অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন, ২০০৩ (অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন, ২০০৩)

এ আইনে বলা হয়েছে:

ধারা - ৪ : মালগুদাম (warehouse) ও কারখানা লাইসেন্স গ্রহণ সংক্রান্ত;

ধারা - ৬ : এ আইনের অধীন প্রদত্ত কোনো লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য হইবে না;

ধারা - ৭ : বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবনে নকশা অনুমোদন বা অনুমোদিত নকশার সংশোধন সংক্রান্ত;

ধারা - ৮ : বিদ্যমান বহুতল বা বাণিজ্যিক ভবন ব্যবহার সংক্রান্ত বিধান;

ধারা - ১৭ : ধারা ৪ এর বিধান ভঙ্গের শাস্তি সংক্রান্ত;

ধারা - ১৮ : লাইসেন্সের শর্ত পালন না করার শাস্তি সংক্রান্ত;

ধারা - ২০ : শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় নাই এ রকম অপরাধের শাস্তি সংক্রান্ত;

ধারা - ২৩ : কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত।

পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের মজুরি প্রসঙ্গ

আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের তুলনায় অতি সস্তা দরে কঙ্কালসার দেহ আর অপুষ্টির নির্মমতা নিয়ে আমাদের পোশাক শ্রমিকগণ খেটে মরেন দিন-রাত। এত সস্তা শ্রম বাজার পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

আন্তর্জাতিক সংস্থা ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল লেবার অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস সম্প্রতি বিশ্বের যে ২৬টি তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশের শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো দিয়েছে, তাতে বাংলাদেশের অবস্থান সবার নিচে (IGLHR, 2014)। স্বাভাবিকভাবে সবার ওপরে আছে যুক্তরাষ্ট্র। এ দেশের পোশাক শ্রমিকরা প্রতি ঘন্টায় মজুরি পায় সোয়া আট থেকে ১৪ ডলার। বিশ্বের বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ চীনে প্রতি ঘন্টায় মজুরি ৯৩ সেন্ট যা মাসে ৩০০ থেকে ৩৫০ ডলারে দাঁড়ায়। যে ভিয়েতনামকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে, সেই ভিয়েতনামেও শ্রমিকদের মজুরি ঘন্টায় ৫২ সেন্ট, যা মাসে ২০০ ডলার পর্যন্ত ওঠে। সেখানে বাংলাদেশে শ্রমিকদের গড় মজুরি ঘন্টায় মাত্র ২১ সেন্ট। ২০১০ সালের নভেম্বর থেকে বাস্তবায়িত শ্রমিকদের নতুন বেতন কাঠামো

অনুযায়ী গড় বেতন মাত্র তিন হাজার টাকা, যা ডলার হিসেবে মাত্র ৩৮ ডলার। ওভারটাইম মিলে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ওঠে শ্রমিকদের মজুরি। ডলারের হিসাবে ৬০ থেকে ৬৫ ডলার।

মূলত শ্রমিকদের এ কম মূল্যের শ্রমের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত। যদিও বাংলাদেশের জাতীয় শ্রমনীতি- ২০১০ এ বলা হয়েছে:

শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬- এর আওতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সেক্টরভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হবে। তাহলে একদিকে শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১০)।

সারণি ২: দেশওয়ারী ঘন্টা প্রতি মজুরি

দেশ	ঘন্টা প্রতি মজুরি
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	$ ৭.২৫
ইউকে	$ ৮.১৯
চীন	$ ১.৯৯
মালয়েশিয়া	$ ২.৩৯
থাইল্যান্ড	$ ২.৮৬
ভারত	$ ১.০২
ভিয়েতনাম	$ ১.৫২
শ্রীলঙ্কা	$ ০.৮১
পাকিস্তান	$ ২.০৪
ইন্দোনেশিয়া	$ ১.১৪
কম্বোডিয়া	$ ০.৬১
বাংলাদেশ	$ ০.২৫

সূত্র: Wikipedia, Free Encyclopedia, 2015.

সারণি ৩: যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিকারক শীর্ষ ১৫ দেশের পোশাক খাতের মাসিক মজুরি (পিপিপি ডলারে; ২০০১ সালের ডলারের মূল্যমানে)

দেশ	২০০১	২০১১	বৃদ্ধি/হ্রাস (%)
বাংলাদেশ	৯৩.৬৭	৯১.৪৫	-০২.৩৭
কম্বোডিয়া	১৬১.৮৯	১২৬.২৬	-২২.০১
চীন	১৪৪.৮৬	৩২৪.৯০	১২৪.২৯
ডমিনিকান রিপাবলিক	২৯৩.৫২	২২৩.৮৩	-২৩.৭৪
এল সালভাদর	৩৩২.৪৪	২৯৪.১৪	-১১.৫২
গুয়াতেমালা	৩৯৭.৬২	৩৪৫.৭৫	-১৩.০৫
হাইতি	১০৪.৪২	১৫৪.৭৮	৪৮.২২
হন্ডুরাস	৩৫৯.৪৭	৩২৭.৯৮	-৮.৭৬
ভারত	১৫০.২০	১৬৯.৬৭	১২.৯৬

দেশ	২০০১	২০১১	বৃদ্ধি/হ্রাস (%)
ইন্দোনেশিয়া	১৩৪.৯০	১৮৬.৬৪	৩৮.৩৫
মেক্সিকো	৭৫৫.১৪	৫৩৬.৫৭	-২৮.৯৪
পেরু	৩৩৫.৯৩	৩৯৩.৪৩	১৭.১২
ফিলিপাইন	২৪৯.২৫	২৩৩.৩৯	-৬.৩৬
থাইল্যান্ড	৩৬০.৩৩	৩৩৭.১২	-৬.৪৪
ভিয়েতনাম	১৮২.৪৩	২৫৪.৭৮	৩৯.৬৬

সূত্রঃ Workers Rights Consortium, 2012.

গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ও কর্মচারীর জন্য ২০১৩ সালে ঘোষিত নিম্নতম মজুরি হার (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৩)

তফসিল 'ক' - শ্রমিক মজুরি

মাস: ২৬ দিন (২০৮ ঘন্টা)

দিন: ৫ ঘন্টা (আহার ও বিশ্রামের বিরতি ব্যতীত একজন শ্রমিকের কর্ম ঘন্টা)

শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	মূল মজুরি (টাকা)	বাড়িভাড়া ভাতা (৪০% হারে) (টাকা)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ও খাদ্য ভাতাসহ মোট মজুরি (টাকা)
১	২	৩	৪	৫
গ্রেড- ১	৮,৫০০/-	৩,৪০০/-	২৫০/-	১৩,০০০/-
গ্রেড- ২	৭,০০০/-	২,৮০০/-	২৫০/-	১০,৯০০/-
গ্রেড- ৩	৪,০৭৫/-	১,৬৩০/-	২৫০/-	৬,৮০৫/-
গ্রেড- ৪	৩,৮০০/-	১,৫২০/-	২৫০/-	৬,৪২০/-
গ্রেড- ৫	৩,৫৩০/-	১,৪১২/-	২৫০/-	৬,০৪২/-
গ্রেড- ৬	৩,২৭০/-	১,৩০৮/-	২৫০/-	৫,৬৭৮/-
গ্রেড- ৭	৩,০০০/-	১,২০০/-	২৫০/-	৫,৩০০/-
শিক্ষানবিস (সর্বোচ্চ ৬ মাস)	২,২০০/-	৮৮০/-	২৫০/-	(সর্বসাকুল্যে) ৪,১৮০/-

তফসিল 'খ' - কর্মচারী মজুরি

মাস: ২৬ দিন (২০৮ ঘন্টা)

(দিন: ৮ ঘন্টার আহার ও বিশ্রাম বিরতি ব্যতীত একজন কর্মচারীর কর্মঘন্টা)

কর্মচারী পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	মূল মজুরি (টাকা)	বাড়িভাড়া ভাতা (৪০% হারে) (টাকা)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ও খাদ্য ভাতাসহ মোট মজুরি (টাকা)
১	২	৩	৪	৫
গ্রেড- ১	৬,৫০০/-	২,৬০০/-	২৫০/-	১০,২০০/-
গ্রেড- ২	৫,০০০/-	২,০০০/-	২৫০/-	৮,১০০/-

কর্মচারী পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	মূল মজুরি (টাকা)	বাড়িভাড়া ভাতা (৪০% হারে) (টাকা)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ও খাদ্য ভাতাসহ মোট মজুরি (টাকা)
গ্রেড- ৩	৪,৫০০/-	১,৮০০/-	২৫০/-	৭,৪০০/-
গ্রেড- ৪	৩,২৫০/-	১,৩০০/-	২৫০/-	৫,৬৫০/-
শিক্ষানবিস (৬ মাস)	২,৩০০/-	৯২০/-	২৫০/-	(সর্বসাকুল্যে) ৪,৩২০/-

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার

আঁধার রাতের বুক চিরে কালো জুলমাতের পর্দা উঁচিয়ে বিশ্বমানবতার মুক্তি ও কল্যাণের দিশা হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিল জীবন বিধান আল্ ইসলাম। বিশ্বনবি হচ্ছেন ইসলামের প্রধান ও পবিত্রতম মুখপাত্র। আর সংক্ষেপে ইসলাম হলো- কুরআন ও সুন্নাহর সমাহার। বিশ্বনবির পবিত্র জীবনে ও কর্মে কুরআনের দর্শন মূর্ত হয়ে উঠেছে। কুরআনের মূর্ত প্রতীক তিনি।

ইসলাম মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় ও বলিষ্ঠ রক্ষা কবচ। ইসলাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল পেশা, শ্রেণি, ধর্মসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মৌলিক ও অমৌলিক সব রকম অধিকার নিশ্চিত করেছে। এখানেই ইসলামের স্বাতন্ত্র এবং এটিই তার অনুপম ও অনবদ্য বৈশিষ্ট্য। আমরা এ ক্ষুদ্র পরিসরে ইসলামে শ্রমিকের অধিকার নিয়ে কথা বলবো।

ইসলাম শ্রমিকের অধিকার প্রশ্নে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

> ইহারা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টণ করে? আমিই উহাদের মধ্যে উহাদের জীবিকা বন্টণ করি, পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের ওপর মর্যাদার উন্নত করি যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে; এবং উহারা যাহা জমা করে তাহা হইতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর (সুরা যুখরুফ, ৪৩: ৩২)।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

> যেন তারা সে ফল খেতে পারে যা তাদের হাত দিয়ে উৎপাদিত হয়েছে (সুরা ইয়াসিন, ৩৬: ৬৫)

বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ সা. নিজেও ছিলেন একজন শ্রমিক। তিনি কর্মীর হাতকে শ্রদ্ধা করেছেন। ভালোবেসেছেন দুনিয়ার মেহনতি মানুষকে। কবির ভাষায়: 'নবির শিক্ষা, করো না ভিক্ষা, মেহনত করো সবে'। মহানবি সা. তাঁর জীবনের একটি অংশ পশুচারণ ও পালন করে অতিবাহিত করেছেন। তিনি ছিলেন মেষের রাখাল। নবি সা. বলেছেন: নবুওয়াত ও রিসালাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগেই সকল নবি ও রসুল বেশ কিছুকাল পশুচারণ ও পালন করেছেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো- আপনিও কি পশুচারণ করেছেন? তিনি তখন বললেন: হ্যাঁ, আমিও বেশ কিছুদিন কারারিত উপত্যকায় মক্কাবাসীদের পশু চড়িয়েছি (সীরাতে ইবনে হিসাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬)।

শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ ও পরিশোধ

শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ ও যথাসময়ে পরিশোধের ব্যাপারে নবি করিম সা. সতর্ক ও সাবধান থাকার জন্য কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন। যাতে এ নিয়ে কোনো মনোমালিন্য বা অসন্তোষ তৈরি না হয়। এক্ষেত্রে তিনি ইনসাফপূর্ণ নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন। একজন শ্রমিক যাতে যথাসময়ে ন্যায্য মজুরি অনায়াসে পেতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখা

প্রতিটি মালিকের প্রধান কর্তব্য। কেননা, শ্রমিক তাঁর কাজ শেষে সঠিক সময়ে সঠিক মজুরি না পেলে তাঁর ভেতরে কষ্ট, হাহাকার ও হতাশা জন্ম নেয়। শ্রমিক তখন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তাঁর কর্মস্পৃহা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণের খরচ যোগাতে গিয়ে তিনি তখন দিশেহারা হয়ে পড়েন।

রসুল সা. বলেছেন:

মজুরি নির্ধারণ ব্যতীত কোনো শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা অনুচিত (সহিহ বুখারি);

তুমি যখন কোনো মজুর নিয়োগ করবে তখন তাকে তার মজুরি কত হবে অবশ্যই জানিয়ে দেবে (সুনানে নাসাঈ শরীফ)।

শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকাবার আগেই তার মজুরি পরিশোধ করে দাও (সুনানে ইবনে মাজাহ)।

কিয়ামাতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আমার ঝগড়া হবে, এর মধ্যে একজন সে, যে মজুরের দ্বারা কাজ পুরোপুরি আদায় করে নিয়েছে, কিন্তু তার পারিশ্রমিক দেয়নি (সহিহ বুখারি)।

মজুর-শ্রমিক-ভৃত্যদিগকে যথারীতি খাদ্য ও পোশাক দিতে হবে (মুয়াত্তা ইমাম মালেক এবং সহিহ মুসলিম)।

শ্রমিকের অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি (Over Time Bill) প্রদান

অনেক সময় মালিক শ্রমিককে দিয়ে নির্ধারিত কর্মঘন্টার পরেও অতিরিক্ত কাজ করান। বাস্তবতার আলোকে অনেক ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন অনিবার্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের জন্য অধিক পারিশ্রমিক দেয়া উচিত। রসুল সা. বলেন: তোমরা যদি তাদের ওপর অধিক কাজ করার দায়িত্ব চাপাও, তবে সেই হিসেবে 'বাড়তি মজুরি' দিয়ে তাদেরকে সাহায্য কর।

শ্রমিককে ব্যবসার লভ্যাংশ (Workers Profit Participation) প্রদান

শ্রমিকগণ দিন-মান খেটে, পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে কাজ করেন। তাঁর হাড়ভাঙ্গা শ্রম নিয়ে মালিক ব্যবসা পরিচালনা করেন এবং লাভবান হন। সুতরাং মালিকের লভ্যাংশে শ্রমিকেরও হিস্যা থাকা প্রয়োজন। এটিই ইনসাফের নীতি। রসুল সা. বলেন: মজুর ও শ্রমিককে তার শ্রমোৎপাদিত দ্রব্য থেকেও অংশ প্রদান কর। কারণ, আল্লাহ তায়ালার মজুরকে কিছুতেই বঞ্চিত করা যায় না (মুসনাদে আহমদ)।

শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ (Compensation) প্রদান

কাজ করার সময় শ্রমিককে যথেষ্ট ঝুঁকি নিতে হয়। তিনি শ্রম, ঘাম বিনিয়োগ করেন। তাঁর পুরো দেহ, মন ও মনন নিবিষ্টভাবে মালিকের কাজে নিবেদিত হয়। মাথার বুদ্ধি, চোখের দৃষ্টি, কানের শ্রবণ শক্তি, বাহুর বল, পায়ের পদচারণা ইত্যাদি সামষ্টিকভাবে কাজ করে চলে। ফলে কর্মরত অবস্থায় দেহের যে কোনো অংশ যেকোনো সময় জখম হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সুতরাং, যদি শারীরিক কোনো জখম হয় সেক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার থাকে মালিকের পক্ষ থেকে ন্যায্য ক্ষতি পূরণ লাভের। রসুল সা. বলেছেন: ক্ষতি যথাসাধ্য প্রতিরোধ ও পূরণ হতে হবে (আহকামুল আমল ওয়াহু কুকুল আম্মাল পৃ. ২৬)।

শ্রমিকের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ, ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন

শ্রমিকের প্রতি মালিকের সার্বিক আচরণ হওয়া উচিত সহানুভূতিসুলভ ও হৃদ্যতাপূর্ণ। মালিক হবেন প্রকৃত অর্থেই শ্রমিক বান্ধব। কাজ করতে গিয়ে মানুষ ভুল করেন। শ্রমিকরাও ভুল করতে পারেন। এ ভুলগুলো যথাসম্ভব ক্ষমা সুন্দর

দৃষ্টিতে দেখা উচিত। প্রতিটি ভুল মমতার চাদর দিয়ে শুধরে দেয়া উচিত। ভুল ইচ্ছেকৃত আবার অনিচ্ছেকৃতভাবেও হতে পারে। প্রতিটি অনিচ্ছেকৃত ভুলের মার্জনা হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

> আমি তোমার ওপর কোনোরূপ কঠোরতা করতে চাই না, কোনো কঠিন ও দুঃসাধ্য কাজ তোমার ওপর চাপাতেও চাই না, আল্লাহ তায়ালা চাইলে তুমি আমাকে সজ্জন ও সদাচারী হিসেবেই দেখতে পাবে (সুরা কাসাস, ২৮: ২৭)।

রসুল সা. বলেছেন: মজুর ও চাকরের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা মহত্বের লক্ষণ।

তোমাদের কোনো ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য তৈরি করে নিয়ে আসে তখন তাকে হাতে ধরে নিজের সাথে বসাও, সে যদি বসতে অস্বীকার করে তবু দু-এক মুঠি খাদ্য অন্তত তাকে অবশ্যই খেতে দেবে। কারণ, সে আগুনের তাপ, ধোঁয়া ও খাদ্য প্রস্তুতের যাতনা সহ্য করেছে (সহিহ আত্-তিরমিযী)।

তোমাদের অধীন ব্যক্তিরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তায়ালা যে ভাইকে অন্য ভাইয়ের অধীন করে দিয়েছেন তাকে তাই খাওয়াবে যা সে নিজে খায় এবং তাকে তাই পরতে দিতে হবে যা সে নিজে পরিধান করে (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)।

হযরত উমর ফারুক রা. এক জিম্মিকে (ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) ভিক্ষা করতে দেখে বিশেষ দুঃখিত হয়ে বললেন: এক ব্যক্তির যৌবনকালে তার দ্বারা (ট্যাক্স, কাজ ইত্যাদি দিক দিয়ে) উপকৃত হওয়ার পর তার বার্ধক্য অবস্থায় তাকে অসহায় করে ছেড়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়।

শ্রমিকের ওপর সাধ্যাতিরিক্ত কাজ প্রদান না করা

সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ শ্রমিকের ওপর চাপিয়ে দেয়া অনুচিত। এতে শ্রমিকের দেহ মন ভেঙে যায়। শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে। জীবনী শক্তির দ্রুত হ্রাস ঘটে। সর্বোপরি কাজের মানও কমতে থাকে। সুতরাং সাধ্যের বাইরে শ্রমিককে দিয়ে কাজ করানো অন্যায় ও অমানবিক। আল্লাহ তায়ালা বলেন: আল্লাহ তায়ালা কারও ওপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেন না (সুরা বাকারা, ২: ২৮৬)।

রসুল সা. বলেছেন: শক্তি সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ শ্রমিকদের ওপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোনো কাজ তাকে দাও তাহলে সেই কাজে তাকে সাহায্য কর (সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিম)।

শ্রমিককে এমন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না যা তাকে সেটির দুঃসাধ্যতার কারণে অক্ষম ও অকর্মণ্য বানিয়ে দেবে (সহিহ বুখারি)।

কর্মী, অধীনস্থ প্রসঙ্গ

মহানবি সা. শ্রমিকের সাথে সদ্ব্যবহার করতে বলেছেন। এমন আচরণ করতে বলেছেন যাতে তাঁরা প্রাণবন্ত থাকেন এবং প্রণোদিত হন। বিদায় হজের ভাষণে তিনি বলেন: তোমাদের গোলাম, তোমাদের ভৃত্য, তোমরা নিজেরা যা খাবে, তা-ই তাদের খাওয়াবে; নিজেরা যা পরবে, তা-ই তাদের পরতে দিবে।

আবু মাতার আল-বাসরী থেকে বর্ণিত: তিনি [হযরত আলী-রা.] তার দাসকে কয়েকবার ডাকলেন। কিন্তু সে কোনো উত্তর দিলো না। আলী রা. বেরিয়ে আসলেন এবং তাকে দরজার কাছেই পেলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: কেন তুমি আমার ডাকে সাড়া দিলে না? সে বললো: আমি আপনার ডাকে অলসতা করেছি এবং আপনার শাস্তি থেকে আমি নিরাপদ বোধ করি। তিনি বললেন: সব প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাদের কাছ

থেকে তার সৃষ্টি নিরাপদ বোধ করে। যাও! তোমাকে মুক্ত করে দিলাম আল্লাহ তায়ালার সত্তার কারণে (আল-মানাক্বিবে ইবনে শাহর আশুব: ২/১৩৩, আল-ফাখরী: ১৯)।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত: আমি ইমাম হোসেইন রা.- এর সাথে ছিলাম যখন একজন দাসী তার কাছে আসলো। সে তাঁর হাতে একগুচ্ছ ফুল নিয়ে এসে ইমামকে উপহার দিলো এবং তাঁর প্রশংসা করলো। তিনি তাকে বললেন: তুমি মহান আল্লাহ তায়ালার সত্তার কারণে মুক্ত। আমি বললাম: সে আপনার প্রশংসা করছে এবং সে তো ছোট এক গুচ্ছ ফুল দিচ্ছে, আর এজন্য আপনি তাকে মুক্ত করে দিচ্ছেন?! ইমাম বললেন: মহান আল্লাহ তায়ালার শিক্ষা এরকমই। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে,

> যখন তোমাদের শুভেচ্ছা জানানো হয় একটি অভিবাদনের মাধ্যমে, শুভেচ্ছা জানাও এর চেয়ে ভালো একটির মাধ্যমে অথবা তা-ই ফেরৎ দাও (সুরা নিসা, ৪: ৮৬)।

একটি ঘটনা

যায়েদ এক যুবকের নাম। শৈশবে আরব বেদুইন ডাকাতদল তাঁকে একটি কাফেলা থেকে অপহরণ করে উকায মেলায় ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে। হাকীম ইবনে হিযাম তাঁকে আপন ফুফু খাদিজা রা.-এর জন্য কিনে নেন।

বিয়ের পর হযরত খাদিজা ক্রীতদাসটিকে হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কাছে অর্পণ করেন। মহানবি সা.-এর মনের পবিত্রতা, স্বচ্ছতা এবং তাঁর উত্তম চরিত্রের কারণে ছেলেটি তাঁর প্রতি অনুরাগী ও ভক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি যায়েদের পিতা যখন ছেলের খোঁজে মক্কায় আসেন এবং মহানবি সা.-এর কাছে তাঁকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য আবেদন জানান, যাতে করে তাঁকে মায়ের কাছে ও পরিবারের মাঝে নিয়ে যেতে পারেন, তখন তিনি পিতার সাথে যেতে অস্বীকৃতি জানান। বরং মহানবির কাছে থাকাকে নিজের জন্মভূমি এবং আত্মীয়-স্বজনের মাঝে থাকার ওপর অগ্রাধিকার দেন। রসুল সা. তাঁর নিকটে থাকা বা নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি যায়েদের ওপর ছেড়ে দেন। এটি ছিল উভয় পক্ষের আত্মিক আকর্ষণ ও মমতার নিদর্শন। যায়েদ যেমন মহানবি সা.-এর চারিত্রিক মাধুর্যের প্রতি গভীর অনুরক্ত ছিলেন, মহানবিও তেমনি তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। এ ভালোবাসা এতটা প্রগাঢ় ছিল যে, তাঁকে তিনি আপন সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেন। ফলে সাহাবাগণ তাঁকে 'যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ' বলতেন। মহানবি সা. ব্যাপারটি আনুষ্ঠানিক হবার জন্য একদিন যায়েদের হাত ধরে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেন: এ হচ্ছে আমার সন্তান। এ আত্মিক টান ও মমত্ববোধ ততদিন বলবৎ ছিল যতদিন না মুতার যুদ্ধে যায়েদ শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর ইন্তিকালে মহানবি ঔরসজাত সন্তান হারানোর মতোই শোকাহত হন (শাইখ ইবনে আতির, ২০১১)।

শ্রমিকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

মালিকের পাশাপাশি শ্রমিকেরও বিস্তর দায়িত্ব রয়েছে। শ্রমিক মালিকের প্রতি বিবেকের দায়ে দায়বদ্ধ ও বিশ্বস্ত থাকবেন। এটিকে তিনি হালাল রুজি আহরণকল্পে ইবাদততুল্য জ্ঞান করবেন। শ্রমিক নির্ধারিত সময়ে কর্মস্থলে হাজির হবেন। নির্মল চরিত্র নিয়ে নিরলসভাবে মন দিয়ে কাজ করবেন। কাজের যাতে ক্ষতি না হয় অথবা মালিকের সম্পদের যাতে কোনোরূপ ক্ষতি না ঘটে সেদিকে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

> তুমি যাকেই মজুর হিসেবে নিযুক্ত করবে, তন্মধ্যে শক্তিমান ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা উত্তম (সুরা কাসাস, ২৮: ২৬)।

> যে ব্যক্তি বিশ্বাস ভঙ্গ করে-অর্পিত কাজ বা জিনিস বিনষ্ট করে আল্লাহ তায়ালা তাকে পছন্দ করেন না (সুরা নিসা, ৪: ১০৭)।

এ ব্যাপারে রসুল সা. বলেছেন: তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই স্ব-স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কর্মচারী তার মনিবের মালের জন্য দায়িত্বশীল এবং সেজন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে (সহিহ বুখারি এবং সহিহ মুসলিম)।

গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক। সে তার অনুমতি ছাড়া তা ব্যয় করবে না (সহিহ বুখারি)।

রসুল সা. বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন কোনো শ্রমের কাজ করবে তখন তা নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করবে, এটিই আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন (সুনানে বায়হাকী)।

শ্রমিকগণ অহেতুক সংঘবদ্ধ হয়ে মালিকের বিরুদ্ধাচারণ করবেন না। মালিকের কাছে অন্যায়-অন্যায্য দাবী নামা পেশ করবেন না। এমনভাবে কাজ করবেন না যাতে কর্মমান, কর্মপরিবেশ অথবা উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান ক্রমশ নীচে নেমে যায়। কারণ এতে মালিকের ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। মালিক অনেক আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কষ্টার্জিত অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। শ্রমিককে মনে রাখতে হবে যে, কর্মমান ভালো হলেই ব্যবসায়ে প্রসার ঘটবে, মালিকের মুখে হাসি ফুটবে এবং তখন মালিকও শ্রমিকের মজুরিসহ সুবিধা বৃদ্ধির স্বাভাবিক সুযোগ পাবেন।

সুপারিশমালা

১. শ্রম আইনে অনেক ভালো ভালো কথা থাকলেও প্রায়োগিক ব্যর্থতা একটি বড় বাঁধা। এ বাঁধা অপসারণের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহকে সততার সাথে আন্তরিকভাবে ঘন ঘন মনিটরিং জোরদার করতে হবে। শ্রম আইন লঙ্ঘনকারী মালিকগণকে উপযুক্ত জবাবদিহির পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে, আইন-আদালতের মুখোমুখি করতে হবে। এক্ষেত্রে আইন যাতে তার নিজস্ব গতিতে স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে জাতীয় স্বার্থে তা নিশ্চিত করতে হবে;

২. পোশাক শিল্প কারখানায় ভবনধস ও অগ্নিকান্ড বন্ধের লক্ষ্যে ইমারত আইন, ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন ইত্যাদি হুবহু প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা ও যাচাই করার উদ্দেশ্যে শ্রম পরিদপ্তর, অগ্নি নির্বাপন অধিদপ্তর সহ ভবনের নকশা অনুমোদনের সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে;

৩. এক শ্রেণির রাজনৈতিক নেতা এবং কতিপয় অসাধু সরকারি কর্মকর্তার তরফ থেকে ঢালাওভাবে আনুকুল্য ও লাইসেন্স পেয়ে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জনের লোভে যেখানে সেখানে যত্রতত্র আবাসিক/ অনাবাসিক এলাকা নির্বিশেষে ব্যাঙের ছাতার মতো গার্মেন্টস কারখানা চালু করছেন। ফলে কারখানার নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হচ্ছে, বিতন্ডা বাড়ছে, শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে। এ লক্ষ্যে দেশের তিন থেকে চারটি উপযুক্ত স্থানকে স্থায়ীভাবে গার্মেন্টস পল্লী হিসেবে বাছাই করে দেশের সব গার্মেন্টস শিল্প কারখানা- কে সেসব পল্লীতে স্থানান্তর করতে হবে;

৪. পোশাক শিল্প কারখানাগুলো সামগ্রিকভাবে কম্‌প্লায়েন্স রক্ষা করছেন কি-না অথবা শতকরা কত ভাগ রক্ষা করছেন- বিদেশি ক্রেতাগণ এ বিষয়টি যাতে সরাসরি ও অতি সহজে অবহিত হতে পারেন সে লক্ষ্যে বিদেশি ক্রেতা গোষ্ঠীর সাথে সরকারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি গভীর ও নিবিড় লিয়াজোঁ রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোকে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে;

৫. পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন আছে কি-না, থাকলে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন কিনা, ট্রেড ইউনিয়নগুলো কোনো অপশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা প্রভাবিত হচ্ছেন কি-না অথবা কখনও বা

কোনো পর্যায়ে সীমা লঙ্ঘন করছেন কি-না, এ বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং করার জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, শ্রম দপ্তর ও সুশীল সমাজের মাঝে সুসমন্বয় সাধন পূর্বক শক্তিশালী ও কার্যকর কমিটি গঠন করতে হবে;

৬. গার্মেন্টস মালিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের জন্য পৃথক পৃথকভাবে নৈতিক ও পেশাদারিত্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নে রিপোর্ট পর্যালোচনা করতে হবে;

৭. বাংলাদেশ সরকারের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের লেবার ইন্সপেক্টরগণের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সুযোগ ও সামর্থ বাড়াতে হবে। জনবলও বাড়াতে হবে। প্রকৃত সৎ, চরিত্রবান ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিবর্গকে এ পদে নিয়োগ দিতে হবে;

৮. পোশাক কারখানায় শ্রমিকগণের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে চাকরির অনিশ্চয়তা। শ্রম আইনে এ মর্মে বিধান করা দরকার যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট বছরে কোনো প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন আইনানুগ পদ্ধতিতে যত শ্রমিকের চাকরি অবসান করা হবে- টারমিনেশনের মাধ্যমে অবসানকৃত শ্রমিকের সংখ্যা তদপেক্ষা বেশি হতে পারবে না। টারমিনেশনের বিধানটি এমন হতে পারে যে, যে শ্রমিকের চাকরি অবসান করতে হবে তাকে শুরুতেই ৬০ দিনের জন্য স্ববেতনে বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান করা হবে। ৬০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর অর্থাৎ ৬১তম দিন থেকে টারমিনেশনের প্রক্রিয়া কার্যকর শুরু হবে। এ ৬০ দিনের মধ্যে মালিক/ কর্তৃপক্ষ চাকরি অবসানের নির্দেশনা প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন। এর ফলে টারমিনেশন কাজটি ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে মালিক পক্ষ সহসাই এ পথে অগ্রসর হওয়ার চিন্তা কম করবেন। অন্যদিকে চাকরি অবসানের সিদ্ধান্ত অগত্যা বহাল থাকলেও ঐ শ্রমিক নতুন একটি কর্ম সংস্থানের জন্য যথেষ্ট সময় পাবেন। এভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের চাকরি হারানোর ক্ষতি ও বেদনা অনেকখানি লাঘব হবে;

ছাঁটাই, ডিসচার্জ, ডিসমিস ইত্যাদি আইনানুগ বিধান থাকা সত্ত্বেও কোম্পানির স্বার্থে কেন একজন স্থায়ী শ্রমিককে টারমিনেট করা জরুরি ছিল- এ বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্যে প্রকৃত সত্যতা ও বাস্তবতা যাচাইয়ের এখতিয়ার শ্রম পরিদর্শন দপ্তর ও শ্রম আদালতের থাকবে;

৯. পোশাক কারখানায় বেশিরভাগ শ্রমিক হচ্ছেন নারী। তাঁরা প্রায়শ: মালিক, মালিক বর্গ অথবা পুরুষ সহকর্মীগণের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকেন। এমন ঘটনা হর-হামেশা ঘটে থাকে। অনেক নারী শ্রমিক নির্যাতিত হওয়ার পরেও সামাজিক সন্মান ও জীবনের ঝুঁকির কারণে মুখ খুলেন না। তাঁদের বুক ফাটে তো মুখ ফুটে না। এ লক্ষ্যে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি পোশাক শিল্প কারখানায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি কার্যকর রয়েছে কি-না এবং সে কমিটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন কিনা তা দেখভাল করার জন্যে সরকারের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন উইং থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি শ্রম পরিদর্শক পরিদপ্তরে মহিলা পরিদর্শকও থাকতে হবে। তাঁরা উভয়ে সমন্বয় সাধন করে কাজ করবেন;

১০. পোশাক শ্রমিকদের জন্য একটি হটলাইন (Hotline) স্থাপন করতে হবে। যাতে কর্মক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের নিরাপত্তাহীনতা ও অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ অনায়াসে জানাতে পারেন;

১১. জেনেভা ভিত্তিক সংস্থা আইএলও (ILO) ও বিশ্ব ব্যাংকের সংস্থা আইএফসি (IFC) বাংলাদেশে পোশাক শিল্প খাতে বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রাম চালুর লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর পাশাপাশি কর্ম পরিবেশের উন্নতি ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করার স্বার্থে মালিক, ট্রেড ইউনিয়ন, এমপ্লয়িজ ফেডারেশন ও সরকার সমন্বয়ে যৌথ প্রয়াস চালাতে আগ্রহী। বাংলাদেশ সরকারের উচিত এ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া।

১২. পোশাক শিল্পের জন্য একটি সমন্বিত আচরণবিধি (Unified Code of Conduct) তৈরি করতে হবে।

উপসংহার

একটি রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি নির্ভর করে সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক ও নাগরিকগণের মধ্যকার সংহতির ওপর। একটি সংসারের উন্নতি নির্ভর করে দম্পতির মধ্যকার প্রেমময় সম্পর্কের ওপর। এমনিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা, দপ্তর-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতেও উন্নতি-সমৃদ্ধি নিহিত আছে মালিক-শ্রমিক কর্তা-কর্মী, মনিব-ভৃত্য ইত্যাদির মধ্যকার সু-সম্পর্কের মাঝে। মালিক হবেন মানবিক। তিনি শাসক হবেন না, হবেন দায়িত্বশীল। তিনি অধিনস্থদের প্রতি ইনসাফ করবেন। বৈষম্য, স্বার্থপরতা, দ্বিমুখী নীতি ও কপটতা পরিহার করবেন। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীদের দৈহিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। নারী শ্রমিকগণের সহজাত সীমাবদ্ধতাগুলোকে বিবেচনা করবেন। সীমা লঙ্ঘন করবেন না। আইন মেনে চলবেন। এভাবেই ফুটে উঠবে কম্‌প্লায়েন্স এর মূল দ্যোতনা।

অন্যদিকে শ্রমিকও মালিকের স্বার্থের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। মালিক যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হন সেদিকে দৃষ্টি রাখা এবং সেভাবে কাজ করা তাঁর জন্য জরুরি কর্তব্য। এভাবে ক্রমান্বয়ে দ্বিপাক্ষিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভব। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে কম্‌প্লায়েন্স এর সার্থকরূপ পরিগ্রহণে এ কথাগুলো খুব বেশি মাত্রায় প্রযোজ্য।

মোদ্দা কথা হলো, উভয় পক্ষকেই নিজেদেরকে 'অভিভাবক' তথা জিম্মাদার ভাবতে হবে। বিশেষত সবার ভেতরে এ চিন্তা সতত ক্রিয়াশীল থাকা দরকার যে, সব মালিকের উর্দ্ধেও রয়েছেন বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র এক মহান মালিক- যিনি 'আহকামুল হাকিমীন'। সবাইকে একদিন তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে এবং সু-কঠিন জবাবদিহির মুখোমুখি হতে হবে।

মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুপম, স্বচ্ছ, উদার, মানবিক, ন্যায়ানুগ ও খোদাভীরু হওয়ার মাধ্যমেই কেবল আমাদের পোশাক শিল্প খাতে একটি প্রকৃত মহিমময় ও মুখরিত কর্মপরিবেশ রচিত হতে পারে। ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বোপরি উম্মাহ্‌র উন্নতিও এর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আর এটিই ইসলামের শাশ্বত শিক্ষা এবং সমগ্র জাতির ঐকান্তিক প্রত্যাশা।

গ্রন্থপঞ্জি

অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন, ২০০৩, বাংলাদেশ গেজেট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৩।

আহকামুল আমল ওয়াহু কুকুল আম্মাল পৃ. ২৬।

কুরআন শরীফ, আল কুরআন একাডেমি, লন্ডন, প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ২০০২।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের শ্রমিকগণের নিম্নতম মজুরির হার, বাংলাদেশ গেজেট, এস. আর. ও নম্বর ৩৬৯-আইন/২০১৩, ডিসেম্বর, ২০১৩।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় শিল্পনীতি, শিল্প মন্ত্রণালয়, ২০১০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *উৎপাদনশীলতা, পণ্যমান ও পণ্যের আদর্শ গুণগতমান*, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১০।

দৈনিক কালের কণ্ঠ, ঢাকা, ১০ জুন ২০১৩।

দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর ২০১২।

বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ গেজেট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুলাই, ২০১৩।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, বাংলাদেশ গেজেট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর, ২০০৬।

মুসনাদে আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর, ১৯৯২।

মুয়াত্তা ইমাম মালেক (র.), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

শাইখ ইবনে আতির, উসদুল গাবাহ ফি মারিফাত-উস-সাহাবাহ (র.): 'যায়েদ' অধ্যায়, মুসলমান ভাই প্রকাশনা, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, পাকিস্থান, ডিসেম্বর, ২০১১।

সহিহ বুখারি শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯।

সহিহ মুসলিম, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা; প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯১।

সহিহ আত্-তিরমিযী, হুসাই আল-মাদানী প্রকাশনী, বংশাল, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১১।

সুনানে বায়হাকী, আল-ফাতাহ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ২০০২।

সুনানে ইবনে মাজাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, মার্চ, ২০০২।

সুনানে নাসাঈ শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০০।

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) Newsletter, Statistical Report & the Apparel Story, Dhaka, Bangladesh, 2014.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) Newsletter, Statistical Report, Dhaka, Bangladesh, 2011.

Bangladesh Knitwear Manufacturers & Exporters Association (BKMEA), Knit Barta, Dhaka, April, 2013.

Institute for Global Labor & Human Rights (IGLHR), *Unprecedented Changes in Bangladesh,* Pittsburgh, USA, October, 2014.

Institute of Apparel Research & Technology (IART), Apparel Export Statistics of Bangladesh, Fiscal Year: 2010-11, Banglamotor, Dhaka, 2011.

Ismail, MR (Ed.) *Heart Rending Cry of Million Workers,* Bangladesh Textile-Garments Workers Federation, 2012.

Wikipedia, Free Encyclopedia, Present Minimum Wages by Country, Compiled, Collected and Edited by Scrap Iron IV, 2015.

Workers Rights Consortium, *Bangladesh's Garments Industry*, Washington, USA, December, 2012.